



---

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 474 - 478

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: [info@tirj.org.in](mailto:info@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

---

# সাঁওতালি মাঘসিম উৎসবে প্রকৃতির অনুষ্ণ : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা

সমীর মণ্ডল

স্বাধীন গবেষক

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : [samirmondal1999@gmail.com](mailto:samirmondal1999@gmail.com)

**Received Date 25. 06. 2025**

**Selection Date 20. 07. 2025**

---

## **Keyword**

Santhal,  
Santhali festivals,  
Maghsim,  
Connection with  
Nature.

## **Abstract**

*In the present time, discussions on the anthropology of different languages, ethnic groups, and tribes are very important in the practice of culture. However, our reluctance to engage with the languages and cultures of specific tribes creates a significant gap in understanding. The cultures of various tribes in India are on the verge of extinction, primarily due to excessive modernization and ecological imbalance. In this essay, I have discussed the Maghsim festival, celebrated by the Santhali tribe as a tribute to nature. According to the Bengali calendar, this festival is observed in the month of Magh (Bengali Month), while in the Santhali calendar, this month marks the beginning of their new year. Santhali people do not engage in any daily activities before performing the Maghsim worship, which takes place the day after Poush Sankranti. Through interviews with members of this tribal community, it has been revealed how this nature-centric festival, is gradually being forgotten. This essay also explores how, the influence of Christianity during the colonial period and the gradual assimilation with Hinduism in the present day have contributed to the erosion of their unique cultural identity. And also, I have provided a detailed description of the Maghsim festival and examined its deep-rooted connection with nature.*

---

## **Discussion**

ভারতবর্ষের সর্বমোট জনসংখ্যার প্রায় ০.৮৬ শতাংশ সাঁওতালি উপজাতির মানুষ বসবাস করে (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী)। তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি, উৎসব নিয়ে বর্তমানে কিছুটা গবেষণা হলেও সেরকম লিখিত পুঁথি বা নথির অনেক অভাব রয়েছে। তার কারণ হিসাবে বলা যেতেই পারে, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকা বা উচ্চবর্ণীয় মানুষদের সাঁওতালি ভাষা শেখার অনিহা। তাছাড়াও বর্তমান প্রজন্মের বিশেষকরে উচ্চ শিক্ষিত সাঁওতাল শ্রেণীর অনেকেই তাদের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন লোকনৃত্য, গান ও উৎসব গুলি ভুলতে চলেছে। আমরা যদি এই কারণের মূল উৎসগুলি খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে লক্ষ্য করা যায় যে, ঔপনিবেশিক পর্বে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন। এই মিশনারীদের সর্বপ্রথম লক্ষ্য ছিল



ভারতবর্ষে আদিবাসী ও নিপীড়িত দলিত মানুষদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা এবং তারপর ধীরে ধীরে সর্বস্তরে খ্রিস্টান ধর্ম ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু, খ্রিস্টান মিশনারীরা তাঁদের বাইবেল প্রচার করতে আসার সময় লক্ষ্য করে এই সাঁওতাল আদিবাসী ও তাঁদের মধ্যে একটা ভাষাগত ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। যারফলে মিশনারীরা ঠিক মতনভাবে নিজদের ভাবনা ও মতাদর্শ তুলে ধরতে পারছিল না। ফলত মিশনারীরা বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সাঁওতালদের (আদিবাসী) পড়াশোনার ব্যবস্থা করে। তারফলে দেখা যায় তাঁরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্য তাঁদের নিজস্ব ধর্ম, উৎসব, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি ভুলে গিয়ে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বর্তমানে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমরা লক্ষ্য করি, উত্তরপূর্ব ভারতে বিশেষ করে নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের অঞ্চলের অনেক আদিবাসী জনজাতি তারা এখন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। অন্যদিকে, দক্ষিণ বঙ্গে যেসমস্ত সাঁওতালরা বসবাস করে তাদের মধ্যে অনেকেই আবার হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে। যেমন বীরভূম, বাকুরা, পুরুলিয়া, বর্ধমান, হুগলি এবং মুর্শিদাবাদে বসবাসরত সাঁওতালদের হিন্দুদের দুর্গাপূজা এবং কালীপূজা ধুমধাম করে পালন করতে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসরত কিছু জনজাতির সাক্ষাৎকারে জানা যায়, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দেবতাদের নাম ও বিভিন্ন সাঁওতালী উৎসবের কথা প্রায় ভুলে গেছে বললেই চলে। খুব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের বাঙ্গালী সংস্কৃতি থেকে শুরু করে নদ-নদী, জেলার নাম, এমনকি আমাদের রাজ্যের নাম পর্যন্ত সাঁওতালী ভাষা থেকেই এসেছে। C.B. Memoria এর মতে, নৈতিক দাবির দিক থেকে এই আদিবাসীরাই হল ভারতবর্ষের সবথেকে পুরোনো বসবাসকারী জনগণ এবং আসল স্বদেশী। বাকি সবাই তাঁদের কাছে বিদেশি। তাঁদের সংস্কৃতিই একমাত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি।<sup>১</sup> অথচ সেই সংস্কৃতি আজ খাতা-কলমে পরিচালিত হলেও প্রতিপালনের দিক থেকে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে চলেছে। এছাড়াও সুকুমার বড়াই তাঁর “Festivals of the santhal of Bengal and Nature : A Discussion” নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কিভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাঁওতালদের বিভিন্ন উৎসব বা সংস্কৃতিতে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।<sup>২</sup>

সাঁওতালরা বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে থাকে। তাঁদের মাস শুরু হয় বাংলা মাঘ মাস (বছরের প্রথম মাস) থেকে। মাসের নামগুলি অনেকটা বাংলা মাসের নামের উচ্চারণ এর মতন – মাঘ (মাঘ), ফাগুন (ফাল্গুন), চৈত (চৈত্র), বৈশাখ (বৈশাখ), ব্যাট (জ্যৈষ্ঠ), আষাঢ় (আষাঢ়), শান (শ্রাবণ), ভাদর (ভাদ্র), দশায় (আশ্বিন), সোহরাই (কার্তিক), আঘোন (অগ্রহায়ন), পোষ (পৌষ)। নামগুলি শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে বাংলা মাসের নামগুলির উৎপত্তি এখান থেকেই। এই প্রতিটি মাসে তাঁদের কোনো না কোনো পালপার্বন হয়েই থাকে। বিশেষ করে মাঘ মাসে ‘মাঘ সিম’ উৎসব, কার্তিক মাসে ‘সোহরাই’, ফাল্গুন মাসে ‘বাহা’। তবে কিছু জায়গার ভিত্তিতে সোহরাই উৎসব কার্তিক মাসে না হয়ে অন্য সময়ে হয়ে থাকে। যেমন বীরভূম জেলার বোলপুরে বালিপাড়া এলাকায়, বর্ধমানের তালিত, গুশকরা এবং হুগলি জেলার কিছু অংশে বসবাসকারী সাঁওতালরা সোহরাই পৌষ মাসে পালন করে থাকে। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, ঝাড়খণ্ডে ১৭৮৪ সালে তিলকা মাঝির নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে সেখানকার সাঁওতালরা সেই সময়ের জন্য তাঁদের সোহরাই উৎসবটি বন্ধ রাখে। তারপরে বিদ্রোহ শেষ হলে তাঁরা পৌষ মাসে সেই উৎসবটি পালন করে।<sup>৩</sup> সুতরাং ধরা হয়ে থাকে তাদের পূর্বসূরীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেও তাঁরা এখনও এই সময়েই (পৌষ মাস) সোহরাই পালন করে থাকে কার্তিক মাসের পরিবর্তে।

**মাঘসিম উৎসব ও প্রকৃতি** - আমার প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়টি হল ‘মাঘসিম উৎসব’। আগেই আলোচনা করেছি যে এই মাঘ মাসটি হল সাঁওতালদের বছরের প্রথম মাস এবং পৌষ সংক্রান্তি হল তাঁদের বছরের শেষদিন। আর পরের দিন অর্থাৎ পয়লা মাঘকে বলা হয় ‘আখান’। এদিন থেকে তাঁদের নতুন দিন গণনা শুরু হয়। তাঁরা এই পয়লা মাঘ থেকে পূর্ণিমার মধ্যে পূজা না হওয়া পর্যন্ত কোনো দৈনন্দিন কাজ যেমন কাঠ-পাতা সংগ্রহ, শিকারে যাওয়া, ঘর ছাউনী দেওয়া বা বেড়া দেওয়ার মতন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয় না। কারণ এই সময়টি তাঁরা খুব শুভক্ষণ বলে মনে করে। আর সময় যে পূজো করা হয় তাকেই ‘মাঘসিম’ বলা হয়। সাঁওতালী ভাষায় ‘মাঘ’ কথার অর্থ হল মাঘ মাস আর ‘সিম’ কথার অর্থ হল মাংস বা মুরগির মাংস। অর্থাৎ মাঘসিম হল পূজো করে মুরগির মাংস খাওয়ার একটা পার্বণ। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,

তাদের এই মাঘসিম পূজো অন্যান্য পূজোর মতন 'জাহের থানে' (সাঁওতালদের পূজোর পবিত্র স্থান)তে না হয়ে তার ঠিক পাশে ফাঁকা একটি স্থানে হয়ে থাকে।

এই উৎসবটি শুরু করার আগে তাঁদের গ্রামবাসীদের নিয়ে সভার আয়োজন করার হয় এবং গ্রামের প্রতিটি মানুষকে 'গোরেত' (বার্তা বাহক) পাঠানো হয়। পূর্বে যদিও কোনো উৎসব আয়োজন করার জন্য আমপাতার সাহায্যে বার্তা পাঠানো হত। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শাল গিরোর ডাকে' উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন যে, তিলকা মাঝির নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য গ্রামবাসীদের শাল গাছের ছালের মাধ্যমে একটা বিরাট জনসভার বার্তা পাঠানো হয়েছিল।<sup>৪</sup> যাইহোক এই গ্রামবাসীদের আশ্রান জানানোর পর মাঝি (গ্রামের মোড়ল) উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থাপনার কথা জানান। পরেরদিন গোরেত গ্রামের কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে প্রতিটি বাড়ি থেকে একটি করে মুরগি এবং সেই সঙ্গে চাল, ডাল, তেল, হলুদ, নুন, লঙ্কা ইত্যাদি খাবারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আদায় করে নিয়ে আসে। অন্যদিকে ন্যেকে অর্থাৎ যিনি গ্রামের প্রধান পুরোহিত, তিনি স্নান সম্পন্ন করে কুলোর মধ্যে তেল, সিঁদুর, মিথি, আতপ চালের গুঁড়ো, কাপি (তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট কাটারি) ও শাল পাতা সাজিয়ে প্রস্তুত করে রাখেন। তারপর সেই কুলোটি তাঁর বাম হাতে করে কোমরে ধরে ডান হাতে একটি জল ভর্তি ঘট নিয়ে পূজোর স্থানে রওনা দেন। আর পেছনে সেই আদায়কৃত সামগ্রী বা জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয়। সেইসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, একজন অবিবাহিত পুরুষ তাঁর কাঁধে করে সাগুন ঠিলি (শুভ কলসি) নিয়ে নায়েকের সাথে যায়।

তারপর প্রধান পুরোহিত অর্থাৎ নায়েকে পূজোর স্থানটিতে প্রায় ২ থেকে ২.৫ ফুট মতন জায়গা গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে নেন এবং সেখানে তাঁর পূজোর ঘট ও কলসিটিকে রাখেন। প্রসঙ্গত, সাঁওতালী ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে তাঁদের প্রথম আদি মানবের জন্ম হয় হাঁস-হাঁসালির দুটো ডিম থেকে, একটি ডিম থেকে জন্ম নেয় পিলচু হাড়াম (পুরুষ) এবং আরেকটি ডিম থেকে জন্ম নেয় পিলচু বুডহি (মহিলা)।<sup>৫</sup> তাঁদেরকে স্মরণ করে নায়েকে সেই ডিম দুটিতে সিঁদুরের ফোঁটা দেন। অবশ্য তার আগে সর্বপ্রথমে তিন কলসিতে সিঁএ বোঙ্গা (সূর্য দেবতা) কে স্মরণ করে সিঁদুর এর ফোঁটা দেন। আর পূজোর স্থানে সেই আদায় করা আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে পূর্বদিক করে মই আকারে সাতটা ঘর করেন। এরপর এক একটা ঘরে এক একজন দেবতাকে অনুস্মরণ করে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। যেমন মারাং বুরু (সাঁওতালদের প্রধান দেবতা), জাহের এরা, মরেক তুরুইক, গোঁসাড়ে, মাঞ্জিহি বোঙ্গা, পারানিক বঙ্গা, নায় বোঙ্গা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য দেবতা।

এরপর মুরগিগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন আতিএ (চারণ মন্ত্ৰ) উচ্চারণ করা হয়। তার আগে অবশ্য মুরগির মাথায় এবং লেজে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে জলের ছিটা দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নায়েকে প্রথমে প্রধান দেবতা মারাং বুরুর ঘরে মুরগিটিকে রেখে আতিয়ে উচ্চারণ করেন -

জহার গোঁসাই মারাং বুরু  
 মা এনখান মাঘসিম ঐতুম তেলে  
 এমাম কান চালাম কান গোঁসাই  
 সুকতে সাঁওয়ারতে আতাংকাঃ গোঁসাই  
 মা গোঁসাই এনখান নওয়া আতোতে  
 যাহা সেং খনাঃ বাইরি ক-ক বল-লেন রেদ,  
 আমগে বাড়ে হডুঃ দারাম সাব দারাম কম গোঁসাই।  
 যাহা সেং খনাঃ নওয়া আতোতে রোগ বিঘিন ক  
 আলম বল হচওয়া সড় হচোয়া আঃ গোঁসাই;  
 আতো অড়া করেন কড়া গিদরৌ ক...  
 সৈঁদরা কারকা ক-ক চালা রেদ,  
 সৌল দারাম ক বাড়ে, হেতরাও কাতে অনে  
 নাপায় তি, নাপায় জাঁগা, তেগেক রুয়ৌর কঃমা

নায় বাড়ে-নাপায় বাড়ে গোঁসাই।<sup>৬</sup>

অর্থাৎ নমঃ নমঃ সিমৌ ঠাকুর। মাঘসিমের নামে তোমাকে প্রদান করছি ঠাকুর। খুশি মনে মেনে নেবে ঠাকুর। দেখবে এই গ্রামে কোনো শত্রু আসলে ঠাকুর। তুমিই তাঁদের ঠেকাবে ঠাকুর। এই গ্রামে যেন কোনো রোগ-অসুখ না ঢুকে ঠাকুর। গ্রামের মানুষেরা শিকারে গেলে। তাঁরা যেন সুস্থ দেহে ঘরে ফেরে ঠাকুর।

এভাবে প্রতিটা ঘরে দেবতাদের অনুস্মরণ করে মন্ত্র উচ্চারিত করা হয়ে থাকে এবং মুরগিটাকে ততক্ষণ ওই ঘরের মধ্যে রাখা চাল খেতে দেওয়া হয়। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ শেষ হলে মুরগির মাথা কেটে মুন্ডুটা ওই ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় এবং নায়েকে তারপাশে গোল করে জল ছিটিয়ে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মুরগিটির মুণ্ডু কাটার পর যতবার মুখে হা করবে ততবার তার মুখে জল দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটি শেষ হলে সবাই এখানে এসে প্রণাম করেন।

এই সময় (সোহরায় ও মাঘসিম পার্বণ দুটোতেই) কিছু কিছু অঞ্চলে জাহের থানের পাশে একটা তালপাতার চালাঘর (৫'x৪'x৪') তৈরি করা হয় এবং তার পাশে একটি বাঁশ পুতে খাড়া করে রাখা হয়। এটাকে বলা হয় 'লাগা ঠাকুর'। তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে মনে করা হয় এই লাগা ঠাকুর ওই এলাকার ওপর নজরদারি রাখেন।<sup>৭</sup>

এই মাঘসিম পূজো করার সাথে ওখান ঠিক কিছু দূরেই একটা উঁচু ঢিবি করা হয়। সেখানে তাঁরা 'সীমা বোঙ্গা' ও 'হরুদ কন্টুত' এর পূজো করেন। সীমা বোঙ্গা হল সীমান্ত রক্ষাকারী দেবতা। অর্থাৎ তিনি শত্রু আক্রমণকারীদের হাত থেকে গ্রামের সীমানা রক্ষা করেন। এই দেবতাই তাঁদের কাছে খুব ভয়ানক একজন দেবতা। সুতরাং তাঁর পূজোও সম্পূর্ণ আলাদা করে করা হয়। অন্যদিকে হরুদ কন্টুত হল পাহাড়, জঙ্গল, নদী-নালা'র দেবতা। এই পূজো করেন কুড়ুম নায়েকে (সহকারী পুরোহিত), নায়েকের পরিবর্তে। সীমান্তের যে জায়গায় পূজো করা হয় সেই জায়গাটা পরিষ্কার করে রাখা হয়। কুড়ুম নায়েকে এই তিন দেবতাদের নাম করে ওই জায়গাটাই তিন ফোঁটা করে সিঁদুরের ফোঁটা দেন। তারপর একটা শালপাতায় আতপ চাল রেখে সেখানে নিজের জন্ম কেটে রক্তের ফোঁটা দেন যতক্ষণ না পাতায় রাখা চালগুলো ভিজে যায়। তারপর কুড়ুম নায়েকে সমগ্র গ্রামের তরফ থেকে সীমা বোঙ্গাকে তা উৎসর্গ করেন। সমগ্র প্রক্রিয়াটি মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'বুল মায়াম'। সবশেষে নায়েকে মারাংবুরুর উদ্দেশ্যে তালপাতার এক ঠোঙ্গা হাড়িয়া উৎসর্গ করেন।

পূজাপর্ব শেষ হলে গ্রাম থেকে আদায়কৃত সামগ্রী দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা হয়, তবে এই খিচুড়িতে কোনো রকম তেল-মশলা দেওয়া হয় না। সেইসঙ্গে মুরগির মাংস ও শূকরের মাংসও রান্না করা হয়। রান্না করা সম্পন্ন হলে নায়েকে একটু খিচুড়ি নিয়ে পূজোর থানের কাছে রেখে আসেন দেবতার উদ্দেশ্যে। তারপর নায়েকেকে উৎসর্গীকৃত মুরগির মাথা দিয়ে খিচুড়ি খাওয়ার জন্য আলাদা করে ব্যবস্থা করা হয়। নায়েকের খাওয়ার পর গ্রামের মানুষদের প্রসাদ হিসাবে খিচুড়ি মাংস বিতরণ করা হয়। সবার খাওয়া শেষ হলে নায়েকে আতপ চালের গুঁড়ো মিশ্রিত জল খাওয়ার এটো স্থানে ছিটিয়ে দিয়ে জায়গাটিকে শুদ্ধ করে দেন। এভাবে মাঘ সিম পূজোর পর সাঁওতালরা তাঁদের দৈন্দিন জীবনের কর্ম অর্থাৎ ঘর ছাউনি দেওয়া, বনজঙ্গলে কাঠ-পাতা কুড়ানো ও শিকারে যাওয়া শুরু করে।

সাঁওতালদের পূজা-পার্বণ বা উৎসবগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, সমস্তটাই প্রকৃতি নির্ভর বা প্রকৃতিকেন্দ্রিক। তাঁদের চাওয়া পাওয়া সবটা প্রায় প্রকৃতি থেকেই। যেমন, বাড় জল থেকে রক্ষা পাওয়া, ধানের ক্ষেতে পোকা না লাগা, তাঁদের বসবাসকারী অরণ্যের পরিসীমার মধ্যে কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ না ঘটে ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রকৃতির কাছে তাঁদের শুভ কামনার জন্য নয়, অশুভ হতে বাঁচার জন্য প্রার্থনা।<sup>৮</sup> মাঘ মাসের বিভিন্ন মরশুমি ফল, ফুলের গাছ এবং নদী-নালা, পাহাড়, জঙ্গলকে দেবতা হিসাবে পূজো করে যে মাঘসিম উৎসব পালন করা হয় তা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বোঝা যায়। সুতরাং বর্তমান সময়ে সাঁওতালী উপজাতির বিভিন্ন উৎসবগুলি বাঁচিয়ে রাখতে গেলে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা ঠিক কতটা জরুরি তা বোঝা দরকার। অথবা অন্যভাবেও বলা যেতে পারে সাঁওতালী উৎসবগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ধরে রাখতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাঁদের প্রতিটি উৎসবের ক্ষেত্রেই বন, জঙ্গল বা গাছপালা অপরিহার্য অঙ্গ। সাঁওতাল গ্রামের পাশেই থাকে শালকুঞ্জ-তাঁদের জাতীয় বৃক্ষ। যেখানে তাঁদের বিশ্বাস, এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সকল গৃহদেবতাদের বসবাস। অর্থাৎ শালবন তাঁদের কাছে



খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তাঁরা তাঁদের গৃহদেবতাদের প্রিয় গাছটিকে ঘিরে নাচে। তাঁরা সেখানে প্রতিটি গাছকে ঘিরে নাচে যাতে কোনোভাবে তাঁদের দেবতাদের আবাস বিশেষ গাছটি বাদ না পড়ে যায়। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা এগুলোকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিলেও তাঁদের প্রকৃতিকে ভালোবাসা বা প্রকৃতিকেন্দ্রিক সমাজ ও উৎসব ব্যবস্থার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। যার কারণস্বরূপ বলা যায়, ১৭৭০ সালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দিলেও অরণ্যে বসবাসকারী এই প্রকৃতি নির্ভর সাঁওতাল উপজাতিদের উপর তুলনামূলক অনেক কম প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। বর্তমান সময়ে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বসতি ও কৃষি জমির প্রসারের জন্য বৃক্ষছেদন বা দামী কাঠের লোভে সাঁওতালদের গুরুত্বপূর্ণ গাছ শাল, সেগুন ইত্যাদি গাছ কাটার ফলে এবং বিশ্ব উন্নয়ন এর মতন আন্তর্জাতিক সমস্যা প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এছাড়াও সাঁওতালদের উৎসবের অঙ্গ-মহুয়া গাছ, শিমুল গাছ যা সুরা প্রস্তুত করতে ও ঘর সাজাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রায় অনেক জায়গায় এই গাছগুলি আর দেখা যায়না। যা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের উৎসবে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং গাছপালা, বন-জঙ্গল, অরণ্য, নদী-নলা এবং সাঁওতালী উৎসব প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সমান্তরাল উপাদান বা একে অপরের পরিপূরক।

## Reference:

1. Memoria, C.B, Tribal Demography in India, Kitab Mahal, 1957, পৃ. ১৪২
2. Barai, Sukumar, Festivals of the santhal of Bengal and Nature: A Discussion, ENSEMBLE vol: 1, No. 1 March 2019, পৃ. ৫৬ (৮)
3. টুডু, কৃষ্ণচন্দ্র, অমর শহীদ বাবা তিলকা মাঝি, রাঁচি, ২০১৪, পৃ. ৬০
4. দেবী, মহাশ্বেতা, শালগিরার ডাকে, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ২৮
5. তদেব, পৃ. ২৪
6. কিস্কু, সোমাই, বোঙ্গাপুরু, সাগুন দশাই, পৃ. ১৪-১৭
7. Kochar, V.K, Village Deities of the santal and Associated Rituals, Nomos Verlagsgesellschaft mbH, <https://www.jstor.org/stable/40458237>, পৃ. ২৫৪
8. হান্টার, ডাবলিউ, ডাবলিউ, অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল (বঙ্গানুবাদ), অনুবাদ অসীম চট্টোপাধ্যায়, সুবর্ণরেখা, ২০১৮, পৃ. ১১৫

## সাক্ষাৎকার :

- পাগান হেম্রম, পেশা-ছাত্র (সাঁওতালি বিভাগ, বিশ্বভারত), বয়স-২৪, তারিখ - ২০/০১/২০২৫
- সুনীল মারান্ডি, পেশা - মুদি, বয়স - ৫৬, বোলপুর, বীরভূম, তারিখ - ২২/০১/২০২৫
- শম্ভু মুর্মু, পেশা - ছাত্র (M.Ed), বয়স - ২৯, চুঁচুড়া, হুগলি, তারিখ - ২৮/০১/২০২৫
- সাধন কিস্কু, পেশা - চাষি, বয়স - ৬২, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, তারিখ- ১০/০২/২০২৫